কুদসের মুক্তির পথ

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

النصر
AN-NASR

نوائے غزوۂ ہند
مطبوعات

কুদসের মুক্তির পথ!

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

কুদসের মুক্তির পথ!

মূল: উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ: আন নাসর অনুবাদ টিম

প্রকাশকাল: ১৬ই জিলকদ ১৪৪৬ হিজরী | ১৪ ই মে ২০২৫ ইংরেজি

স্বত্ব: সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত

প্রকাশক:

আন নাসর মিডিয়া

(আল কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ হালাকা)

যোগাযোগ:

জিও নিউজ: https://talk.gnews.to/channel/an-nasr-media-or-mussh-alnsr

চারপওয়্যার: https://chirpwire.net/nasrmedia

নোট: এই পুস্তিকাটি 'জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা' এর অফিসিয়াল মিডিয়া আউটলেট **'নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দ'** কর্তৃক যিলকদ ১৪৪৬ হিজরিতে প্রকাশিত উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ লিখিত 'কুদস কি আযাদি কা রাস্তা' (قدس کی آزادی کا راستہ) এর বাংলা অনুবাদ।

সূচিপত্র

গাজাবাসীদের শিক্ষা ৪

পথ আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে! ৫

গাজাবাসী একা কেন রয়ে গেল? ৭

গাজা যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা ৮

ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হয়নি ১৪

বিশ্বব্যবস্থা এবং মার্কিন প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ১৫

উন্মাহর শাসক ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা ১৯

১৯৪৮ সালের যুদ্ধ ২১

তোমাদের সেনাবাহিনীই তোমাদের হত্যাকারী! ২৬

ফিলিস্তিনের বাইরে ফিলিস্তিনের যুদ্ধ ২৯

জেরুজালেমের মুক্তি একটি অধিকার ৩২

আমেরিকা অপরাজেয় নয়! ৩৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

সমস্ত সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীদের সর্দার হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের প্রতি।

সালাত ও সালামের পর...

গাজা যুদ্ধ সামান্যতমও সচেতন প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য বহন করে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যে নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে উত্তরণের সংগ্রামে অংশগ্রহণ তার উপর ফরয। এই লেখার উদ্দেশ্য হলো এসব গুরুত্বপূর্ণ বার্তাকে আলোকিত করা। প্রথমে আমরা এই যুদ্ধে প্রকাশিত কিছু মৌলিক সত্য নিয়ে আলোচনা করব, তারপর এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করব যে, ব্যক্তি ও সমষ্টি হিসেবে আমাদের কী করণীয়। কোন সচেতনতা ও জ্ঞান আজ ছড়িয়ে দেওয়া অপরিহার্য, আর কোন পথ অবলম্বন করা মাসজিদুল আকসাকে মুক্ত করা এবং আমাদের দেশগুলোতে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আবশ্যক? মাসজিদুল আকসাকে মুক্ত করা এবং তে আমাদের দেশগুলোতে দ্বীন বিজয়ী করতে সক্ষম হওয়ার জন্য করণীয় কি?

গাজাবাসীদের শিক্ষা

তবে আলোচনা এগিয়ে নেয়ার আগে এই কথাটি বলা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, গাজাবাসী এই পনেরো মাসে ধৈর্য ও অবিচলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে যে ঈমান,

দৃঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর ভরসার প্রমাণ দিয়েছে, তা বস্তুবাদের এই যুগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি বিশ্বাসের এক মহান উদাহরণ স্থাপন করেছে। আল্লাহর প্রতি এই ঈমান ও ভরসা এবং তারপর সেই মহান রবের সাহায্য ও সহায়তা যদি তাদের সঙ্গী না হতো, তবে মাংস-মজ্জার মানুষ কীভাবে এমন কঠিন পরীক্ষাগুলো সহ্য করতে পারত এবং কিভাবে এতে সফল হতে পারত? বন্দীদের মুক্ত করার জন্য তারা যে শর্তগুলো দিয়েছিল, আলহামদুলিল্লাহ, তার একটিতেও তারা পিছপা হয়নি। অন্যদিকে, খোদা হবার মিথ্যা দাবিদার শয়তানরা তাদেরকে কোনো একটি শর্তও মানাতে সক্ষম হয়নি।

এই যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহকে ঈমান, জিহাদের ফরযিয়াত, আখিরাতের চিন্তা এবং শাহাদাতের মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে। এটি পশ্চিমা শয়তানদের অতি নোংরা মুখোশ উন্মোচন করেছে, তাদের মিথ্যাকে ধ্বংস করেছে এবং তাদের এই বার্তাও দিয়েছে যে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত দুনিয়ার পেছনে চলার জন্য নয়, বরং দুনিয়াকে নিজেদের পেছনে নিয়ে চলার জন্য প্রেরিত হয়েছে। আর তাদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের দ্বীন, পবিত্র স্থানসমূহ এবং মহান রবের সন্তুষ্টি।

পথ আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে!

এই যুদ্ধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এটি চিন্তা ও কর্মের সঠিক দিক এখন সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছে। যদি চোখ খোলা থাকে ও মন নির্মল হয়, তবে উম্মাহর মুক্তির পথ বুঝতে এখন কোনো অস্পষ্টতা থাকার কথা না। পথটি সহজ না কঠিন—এ প্রশ্ন শুধু তারাই তুলবে, যাদের মুসলিম

উম্মাহর বর্তমান দুর্দশার কোনো জ্ঞান বা অনুভূতি নেই এবং যারা এই সত্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে, আজ আল্লাহর পথে জিহাদ নামায-রোযার মতো ফরয, এমনকি তার চেয়েও সম্ভবত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এই জিহাদই এখন ঈমান ও আমল রক্ষার মাধ্যম হবে—যেখানে মৃত্যুর বাইয়াত নেওয়া হয়, যেখানে বিজয় ও সাফল্যের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি রবের সন্তুষ্টির আশায় জীবন বিলিয়ে দেওয়া হয়, আর বিনিময়ে শুধু জান্নাতের সুসংবাদই কামনা করা হয়। এই বিনিময় অতীতেও উম্মাহর সাফল্যের গ্যারান্টি ছিল, আজও তাই [1]। অতীতেও এটি ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা ছিল, আজও তাই। আর অতীতেও আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন মুমিনদের সাহায্য করতে সক্ষম ছিলেন, আজও তাই।

অতএব, যতক্ষণ না আমরা সহজ পথ খোঁজার বদলে এটা খুঁজতে শুরু করি যে, আল্লাহ আমার কাছ থেকে কী চান; যতক্ষণ না আমরা দেখি যে বাস্তবতা ও পরিস্থিতি কোন পথকে গন্তব্যে পৌঁছানোর দিকে নির্দেশ করছে—ততক্ষণ আমাদের পরিণতি হবে এই যে, আমরা সেই 'তীহ' মরুভূমিতেই ঘুরে বেড়াবো— যেখান থেকে বের হওয়ার শর্ত মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করেছেন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা। বনি ইসরাঈলের তীহ প্রান্তরে আটকে থাকা কোনো বাহ্যিক বাধা, কারাগার বা শৃঙ্খলের কারণে হয়নি; বরং তারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও কর্মে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং এটাই তাদের

---

[1] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর হত্যা করে এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়।" [সূরা আত-তাওবা ০৯: ১১১]

পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল কারণ ছিল। সুতরাং যদি আমরাও চিন্তা ও কর্মে এবং পথ ও যাত্রায় ভুলের উপর অটল থাকি, তবে আমাদের পরিণতিও তীহ প্রান্তরের মতোই হবে। পদ্ধতির এই ভ্রান্তিতে থাকলে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও আমরা গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব না।

গাজাবাসী একা কেন রয়ে গেল?

এই দীর্ঘ সময় ধরে আমরা গাজাবাসীদেরকে 'আসহাবে উখদুদ'-এর মতো নির্মম পরিণতি ভোগ করতে দেখলাম, অথচ তাদের সাহায্যে আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে ঈমানদার ও দ্বীনদার লোকের অভাব নেই, ইসলামী আন্দোলনও কম নেই—তবুও তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একা কেন রয়ে গেল? তারা দাঁড়িয়েছিল এই আশায় যে উম্মাহ তাদের পিছনে দাঁড়াবে, কিন্তু কেউই তাদের পাশে আসেনি। দূরত্ব বা সীমানা যদি বাধা হয়, তাহলে সেগুলো কখন এবং কেন বাধা হয়ে দাঁড়াল? কী সেই শক্তি বা নিয়ন্ত্রণ যা আমাদেরকে প্রতি পদে পদে অক্ষম করে রেখেছে?

আর সেই কোন শক্তি যা ইসরাঈলকে টিকিয়ে রাখছে, অথচ দেশটি ভেতর থেকে আত্মশক্তি হীন? ইসরাঈলের ভিত্তিহীন ও মূল্যহীন হওয়া এই যুদ্ধে আরও স্পষ্ট হয়েছে, তবুও সে আজও দাঁড়িয়ে কিভাবে সমগ্র উম্মাহকে হুমকি দিচ্ছে? এগুলো এমন প্রশ্ন, যেগুলো গাজার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে—কে আমাদের ওপর আধিপত্য চালাচ্ছে? এই শক্তির ক্ষমতা, প্রভাব ও বিস্তার কতটা? এর বিরুদ্ধে লড়াই কেন জরুরি এবং এই লড়াই কিভাবে সম্ভব?

এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হলে তখন বুঝতে সহজ হবে—মসজিদে আকসাকে মুক্ত করার পথ কোথায় থেকে শুরু হয় এবং কোন পথগুলো অতিক্রম করতে হবে।

গাজা যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা

এই যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসরাঈলের অস্তিত্ব, আমাদের পবিত্র স্থানগুলিতে তাদের দখল এবং মুসলমানদের উপর তাদের বর্বর অত্যাচার—এসবই আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থনের ফল। আমেরিকা ইসরাঈলকে কীভাবে এবং কতটা সাহায্য করেছে? এখানে আমরা সংক্ষেপে তার কিছু ঝলক তুলে ধরছি।

সাত অক্টোবর ইসরাঈলে হামলা হয়েছিল, কিন্তু সেই রাতেই আমেরিকায় মাতম শুরু হয়ে গেল। রাতেই হোয়াইট হাউসে ইসরাঈলের পতাকার আলো জ্বালিয়ে দেখানো হলো যে, আমেরিকা ইসরাঈল থেকে দূরে নয়। এরপর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সামরিক নেতৃত্বও ইসরাঈলে পৌঁছে গেলেন। আমেরিকা সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং মিডিয়াসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসরাঈলের পাশে দাঁড়াল এবং এমন এক দেহ-দুই প্রাণের নজির স্থাপন করল, যেন ইসরাঈল কোনো আলাদা রাষ্ট্র নয়, বরং আমেরিকারই একটি অংশ।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন: "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা ইসরাঈলের সাথে আছি, আমরা ইসরাঈলের সাথে আছি, আমরা ইসরাঈলের সাথে আছি।"

এবং বললেন: "আমরা ইসরাঈলকে কখনো একা ছাড়ব না, যতদিন আমেরিকা থাকবে—আর আমেরিকা চিরকাল থাকবে—ততদিন এটি ইসরাঈলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বারবার মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করে ইসরাঈলের নৃশংসতার এমনভাবে পক্ষ নিলেন যে, মনে হলো তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, বরং ইসরাঈলের মুখপাত্র।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেনও যখন শোকগ্রস্ত মুখে তেলআবিবে গেলেন, তখন অনেক কথার পাশাপাশি এও বললেন: "ইসরাঈল এই যুদ্ধ একা লড়তে পারে, কিন্তু যতদিন আমেরিকা আছে, ততদিন ইসরাঈলকে একা যুদ্ধ করতে হবে না।"

তিনি ইসরাঈলকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, তাদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ শুরু হয়ে গেছে এবং তা কখনো বন্ধ হবে না। আর বাস্তবেও তাই হলো—১৫ মাসে এক দিনের জন্যও এই সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়নি [2]।

আমেরিকা তাদের দুটি বিমানবাহী রণতরী মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করল। এর পাশাপাশি তারা হাজার হাজার সৈন্য ইসরাঈলের অভ্যন্তরে স্থাপন করল, যাদের কাজ ছিল ইসরাঈলি সেনাবাহিনীকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা [3]।

ওয়াশিংটন পোস্ট যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে লিখেছিল যে, যুদ্ধের প্রথম ৫৪ দিনে ইসরাঈল গাজায় ২২ হাজার বোমা নিক্ষেপ করেছিল, যেগুলো সবই

---

[2] আল-জাজিরা

[3] পূর্বোক্ত

আমেরিকান ছিল। ইসরাঈলি টিভি চ্যানেল 12-এর তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকার সাহায্যের মধ্যে বড় আকারের বোমা এবং দুই হাজার পাউন্ড ওজনের বাঙ্কার বাস্টার গোলা ছাড়াও রয়েছে ডজনখানেক এফ-35 যুদ্ধবিমান ও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার [4]।

একটি আমেরিকান সংস্থার তথ্যমতে, গাজার যুদ্ধের এক বছরে আমেরিকা ইসরাঈলকে কমপক্ষে ২২.৭৬ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে, যা ইসরাঈলের মোট ব্যয়ের ৭০ শতাংশ[5]। অন্যদিকে, ৪.৮৬ বিলিয়ন ডলার আমেরিকা নিজেই সেই সময়ে ইসরাঈলের প্রতিরক্ষায় নিজেদের অপারেশনে ব্যয় করেছে[6]।

একটি পশ্চিমা গবেষণা রিপোর্ট অনুসারে, এই যুদ্ধে ইসরাঈল যে পরিমাণ অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে ৬৯ শতাংশ আমেরিকান, ৩০ শতাংশ জার্মান এবং মাত্র ১ শতাংশ তাদের নিজস্ব অস্ত্র। উল্লেখ্য, জার্মানির পক্ষ থেকে এই অস্ত্র সরবরাহও আমেরিকার জার্মানির উপর চাপ সৃষ্টির কারণে হয়েছে। আমেরিকা এও ঘোষণা করেছে যে, ইসরাঈলের অস্ত্রভাণ্ডারে যে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, আমেরিকা তা অব্যাহতভাবে পূরণ করে যাবে[7]।

---

[4] পূর্বোক্ত

[5] Watson Institute for International & Public Affairs (Brown University) COST OF WAR

[6] Associated Press

[7] আল-জাজিরা

আমেরিকা ইসরাঈলে ১৯৮০-এর দশকে অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলে এবং ‘War Reserve Stock Allies-Israel (WRSA)’ নামে পরিচিত এই ডিপো ক্রমাগত সমৃদ্ধ করতে থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে জরুরি অবস্থায় অস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করা। জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশের (বুশ সিনিয়র) আমলে আমেরিকা ইসরাঈলকে এই গুদাম থেকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তাই বর্তমান যুদ্ধে ইসরাঈল এই অস্ত্রভাণ্ডার থেকেও সুবিধা নিচ্ছে[8]।

এই অপরিমিত ও নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যের ইতিহাস নতুন নয়। প্রফেসর থমাস স্টফার (Thomas Stauffer) একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ, যিনি মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার নীতি ও তার অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি তাঁর রিপোর্ট ‘The Costs to the U.S. of the Israeli-Palestinian Conflict’-এ লিখেছেন যে, ১৯৪৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকা ইসরাঈলকে মোট ৩ ট্রিলিয়ন ডলার (৩০ লাখ কোটি ডলার) সাহায্য দিয়েছে।

আমেরিকা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন চুক্তি বা সহায়তার আওতায় ইসরাঈলকে সামরিক সাহায্য দিয়ে আসছে। ২০১৬ সালে উভয়ের মধ্যে একটি ১০ বছরের চুক্তি হয়, যার অধীনে আমেরিকা ইসরাঈলকে বার্ষিক ৩.৮ বিলিয়ন ডলার (৩৮০ কোটি ডলার) সামরিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং এটি ২০১৯ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে।

কেউ একজন যথার্থই বলেছেন— “আমেরিকার বাইরে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটির নাম ইসরাঈল।” গত পনেরো মাসের যুদ্ধও এই সত্যটি স্পষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমেরিকার দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এতটা

---

[8] উদ্ধৃতি: ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান, বুধবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩।

গুরুত্ব কেন? তারা ইসরাঈলের জন্য এত কিছু ত্যাগ করছে কেন? ইসরাঈলের জন্য ঝুঁকিকে নিজেদের জন্য সমান ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করছে কেন?

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমেরিকান খ্রিস্টানরা ধর্মীয় কারণে ইহুদীদের সাহায্য করাকে নিজেদের কর্তব্য মনে করে। এজন্যই ইসরাঈলকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে আমেরিকায় ব্যাপক ঐক্যমত্য রয়েছে।"

এছাড়া, আমেরিকায় ইসরাঈলি লবি AIPAC-এর (আমেরিকান ইসরাঈল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি) বিশাল প্রভাবও এর একটি বড় কারণ। এই লবির উদ্দেশ্য কখনই শান্তি নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো হোয়াইট হাউস, কংগ্রেস এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ইসরাঈলের জন্য সর্বোচ্চ সাহায্য আদায় করা।

এই ব্যাখ্যা সঠিক, তবে ড. আবদুল ওহাব আল-মাসিরি ইসরাঈল-আমেরিকা সম্পর্কের জটিল গিঁটকে আরও গভীরভাবে উন্মোচন করেছেন। ড. আল-মাসিরি ছিলেন জায়নবাদ বিশেষজ্ঞ এবং এই বিষয়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অধ্যাপক ও গবেষক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:

"ইসরাঈলের জন্য আমেরিকার সাহায্যকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন না, এটি আসলে আমেরিকার কৌশলগত (স্ট্র্যাটেজিক) বিনিয়োগ। কারণ সত্যি বলতে, আমেরিকার নিজেরই ইসরাঈলের প্রয়োজন। আপনি ইসরাঈলকে আমেরিকার একটি যুদ্ধবহর হিসেবেই বিবেচনা করুন, আলাদা দেশ হিসেবে নয়! দেখুন! জায়নবাদীরা বলে যে ইসরাঈল আমেরিকার নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যদি ইসরাঈল না থাকত, তাহলে আরব বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমেরিকাকে আরব সাগরে পাঁচটি বড় যুদ্ধবহর

মোতায়েন করতে হত, যেখানে একটি যুদ্ধবহরে বছরে দশ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়। অর্থাৎ, যদি ইসরাঈল না থাকত, তাহলে আমেরিকাকে এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে রাখতে বছরে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হত, অথচ এখন তারা ইসরাঈলকে বছরে মাত্র দশ মিলিয়ন ডলার দেয়। তাই আমি বারবার এই সত্যটি উল্লেখ করেছি যে, জায়নবাদী এজেন্ডার সাফল্যের কারণ আমেরিকার ওপর তাদের আধিপত্য নয়, বরং আমেরিকার নিজস্ব ঔপনিবেশিক প্রয়োজন। থিওডর হার্জেল (জায়নিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা) দেখেছিলেন যে পশ্চিমা বিশ্ব ও আমেরিকার ঔপনিবেশিক এজেন্ডার সাথে আমাদের জায়নিস্ট (জায়নবাদী) পরিকল্পনা পুরোপুরি খাপ খায়, তিনি তাদের এই আকাঙ্ক্ষা দেখে নিজের প্রয়োজন তাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং এভাবেই তিনি সফল হলেন।”[9] [10]

আল-জাজিরার প্রতিনিধি যখন ড. মাসিরিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমেরিকার সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে কি ইসরাঈলের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে?” তখন ড. মাসিরি জবাবে বললেন: “নিঃসন্দেহে ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং এই অনুভূতি জায়নবাদীদের নিজেদেরও আছে। তারা লিখেছে যে, যদি কখনও আমাদের খরচ বেড়ে যায় এবং আমেরিকার পক্ষে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে ইসরাঈলের পতন ঘটবে।”

ড. মাসিরি আরও বলেন, “ইসরাঈলের অস্তিত্বের মূল উপাদানগুলি তার অভ্যন্তরে নয়, বরং বাইরে—অর্থাৎ আমেরিকায় নিহিত। আমি এও বলি যে,

---

[9] আহমদ মনসুরের সাথে ইন্টারভিউ, আল-জাজিরা

[10] ইসরাঈলের গুরুত্ব আমেরিকার কাছে এমনই যে, জো বাইডেনের একটি পুরনো বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছিলেন, “ইসরাঈল যদি না থাকত, আমাদেরকে সেটি তৈরি করে নিতে হতো।”

ইসরাঈল অভ্যন্তরীণ কারণে ধ্বংস হবে না, বরং বাইরের শক্তি, যারা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে, সেগুলোই যদি ধ্বংস হয়, তাহলেই ইসরাঈল ধ্বংস হবে!”[11]

ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হয়নি

কেমন যেন ফিলিস্তিনে শুধু ইসরাঈলেরই দখল নেই, বরং আমেরিকারও দখল আছে। আর আমেরিকা না থাকলে ইসরাঈলের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। এরপর, ফিলিস্তিনে ইসরাঈলি দখলদারিত্বের পিছনে আমেরিকার একটি বড় উদ্দেশ্য হলো— দুনিয়ায় নিজের ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। সেই ব্যবস্থা হলো আমেরিকার সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য, যা মুসলিম বিশ্বের ওপর খুবই সুপরিকল্পিতভাবে নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো চাপিয়ে দেয়। সত্যি কথা হলো, মুসলিম বিশ্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত যে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে চলে গিয়েছিল, তা আজও বিদ্যমান।

অবশেষে উসমানীয় খিলাফতের পতন ঘটল, কিন্তু সেই উপনিবেশ আজও রয়ে গেছে। ব্রিটেন, ইতালি ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হয়েছে, কিন্তু উপনিবেশের দ্বিতীয় যুগ এখনো চলমান। আগে যদি সাত সমুদ্র পেরিয়ে ইংরেজরা এসে আমাদের ওপর শাসন চালাত, আর আমাদের জনগণ অনুভব করত যে তারা পরাজিত ও অধীন— তবে আজ সেই একই উপনিবেশ আমেরিকার রূপে আমাদের ওপর চেপে বসেছে। কিন্তু আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আমরা স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত! অথচ বাস্তবতা হলো, মুসলমানদের

---

[11] আল-জাজিরায় আহমেদ মনসুরের সাথে ড. আবদুল ওহাব আল-মাসিরির সাক্ষাৎকার

এমন এক ইঞ্চি জমিও নেই, যা আমেরিকার কর্তৃত্বের বাইরে। আফগানিস্তান এখানে ব্যতিক্রম, যেখানে জিহাদের বরকতেই আমেরিকা নিজের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বব্যবস্থা এবং মার্কিন প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ

আমেরিকার সত্যিকার অর্থে সারা বিশ্বের সমুদ্রগুলোর ওপর রাজত্ব। এই ক্ষেত্রে চীন ও রাশিয়াও শক্তিশালী, কিন্তু আমেরিকার তুলনায় তাদের প্রভাব অনেক কম। বিশ্বব্যাপী ৭০% সমুদ্রে আমেরিকারই আধিপত্য এবং সব গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথে আমেরিকার দখল। এটি একটি নীতি যে, যার হাতে সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ, তার জন্য আকাশ ও স্থলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা কোনো কঠিন কাজ নয়।[12]

হেনরি কিসিঞ্জার সমুদ্রশক্তির মাধ্যমে বিশ্বে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার এই কৌশলকে 'Diplomacy of a Hundred Thousand Tons' অর্থাৎ 'লাখ লাখ টন ওজনের কূটনীতি' নাম দিয়েছিলেন, কারণ নৌশক্তির মাধ্যমেই আপনি বিশ্বকে আপনার কথা মানাতে পারেন।[13]

আমেরিকা বিশ্বের একমাত্র এমন শক্তি, যার নিজের ভূখণ্ডের বাইরে এত বিপুল সংখ্যক সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্য মোতায়েন করা আছে যে, কখনো

---

[12] যার নৌশক্তি আছে, তার হাতেই বিশ্ব বাণিজ্য, যুদ্ধ ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ।— বিখ্যাত মার্কিন কৌশলবিদ আলফ্রেড থায়ার মাহান, ১৮৯০ সালে এই তত্ত্ব পেশ করেন।

[13] Kissinger: A Biography

কখনো তাদের কংগ্রেস সদস্যদেরও জানা থাকে না যে তাদের সৈন্যরা কোথায় কোথায় deployed আছে। যার হাতে নৌশক্তি আছে, সে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য, যুদ্ধ ও রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। ধারণা করুন, বিশ্বের ৮০টি দেশে আমেরিকার ৮০০-এরও বেশি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। অন্যদিকে, রাশিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশের নিজ দেশের বাইরে সামরিক উপস্থিতি অত্যন্ত সীমিত, না থাকার মতোই।[14] আমেরিকার বিশ্বের ১৫৯টি দেশে কমপক্ষে এক লক্ষ তিরাশি হাজার সৈন্য মোতায়েন করা আছে [15]। এছাড়াও সিআইএ ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার গোপন এজেন্ট এবং প্রাইভেট ফোর্সের সদস্যরা এই সংখ্যার বাইরে, যারা বিশ্বজুড়ে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষায় গোপন যুদ্ধে লিপ্ত।

আমেরিকা তার বৈদেশিক সামরিক শক্তিকে বিশ্বব্যাপী এগারোটি কমান্ডে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে পাঁচটি ভৌগোলিক এবং পাঁচটি অপারেশনের ধরন অনুযায়ী সাজানো। প্রতিটি বাহিনীর নিজস্ব সেনাবাহিনী, নৌ ও বিমানবাহিনী এবং গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক রয়েছে। এভাবে এটি পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, CENTCOM (সেন্ট্রাল কমান্ড) মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে কভার করে। এর সদর দপ্তর ফ্লোরিডায় অবস্থিত, অন্যদিকে এর অপারেশনাল বেস কাতারে। কাতারে Al Udeid Air Base নামে এর একটি বিশাল সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সবচেয়ে বড় সামরিক কেন্দ্র এবং বিশ্বব্যাপী পঞ্চম বৃহত্তম ঘাঁটি। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, জর্ডান, ইরাক, বাহরাইন, তুরস্ক

14 রাশিয়ার নিজ দেশের বাইরে মাত্র ৯ টি সামরিক ঘাঁটি আছে, অন্যদিকে চীনেরও একটি। কিন্তু ফ্রান্সের ১৫টি এবং ব্রিটেনের রয়েছে ১২টি। আসলে এই ফ্রান্স ও ব্রিটেন তো আমেরিকারই মিত্র।

15 আল-জাজিরা

ও সিরিয়াতেও তাদের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। পাকিস্তান ও মিসর প্রভৃতি দেশের সামরিক ঘাঁটিও আমেরিকা ব্যবহার করে আসছে, কারণ এসব দেশের সাথে তাদের গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, লজিস্টিক সহায়তা ও অন্যান্য পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রভাব ও অনুপ্রবেশের প্রশ্নে এটি সুবিদিত যে পাকিস্তান ও মিশরের মতো দেশে কোনো সেনাপ্রধান সম্ভবত আমেরিকার সম্মতি ছাড়া নিযুক্ত হতে পারেন না। আমেরিকা অর্থনীতিকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এই আধিপত্যের একটি বড় মাধ্যম হলো ডলার। যদিও কিছু দেশ এর প্রভাব থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু বিশ্বের ৬০% মুদ্রার রিজার্ভ ডলারে থাকে, তাই বাণিজ্যও প্রধানত ডলারেই হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো ঋণদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আমেরিকার প্রভাবাধীন। এগুলো কেবল সেই সব দেশকেই ঋণ দেয় যারা তাদের শর্ত পূরণ করে, অথচ এসব শর্ত প্রায়ই আমেরিকার স্বার্থ বিবেচনা করে তৈরি করা হয়। আমেরিকা ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়। এই হস্তক্ষেপ সরকারি ও প্রশাসনিক বিষয় থেকে শুরু করে শিক্ষা, আইন ও নিরাপত্তা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। শাস্তি দেয়ার জন্য এটি বাণিজ্যিক ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করে। এইভাবে সরকার পরিবর্তন এবং দেশে বিপ্লব আনার ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকা এতটাই বিখ্যাত যে, এই বিষয়ে একজন আমেরিকান কংগ্রেস সদস্যের মজার কথা প্রচলিত আছে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে রাজনৈতিক বা সামরিক বিপ্লব ঘটে থাকে, কিন্তু কি কারণে আমেরিকায় এখন পর্যন্ত কোনো বিপ্লব ঘটেনি? তার উত্তর ছিল- “কারণ আমেরিকায় কোনো আমেরিকান দূতাবাস নেই।”

বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতিসংঘও তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো নিরাপত্তা পরিষদ, যার পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্ব যদি কোনো বিষয়ে একমতও হয়, কিন্তু এই পাঁচ সদস্যের মধ্যে কেউ একজনেরও ভেটো হলে সারা বিশ্বের মতামত বিফলে যায়। যেহেতু আমেরিকা অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী, তাই বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্তগুলিতে অন্যান্য চার সদস্যের তুলনায় আমেরিকার প্রভাব বেশি। গাজা যুদ্ধের সময় যতবারই যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তাব জাতিসংঘে উত্থাপন করা হয়েছে, আমেরিকা সেগুলোতে ভেটো দিয়েছে।

আরও উল্লেখ্য, জাতিসংঘ বিশ্বজুড়ে শিক্ষা ও সচেতনতা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শরণার্থী সহায়তা, স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশ্বিক কর্মসূচি পরিচালনা করে। এই সংস্থাগুলোকেও তারা তাদের বিশেষ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ইউএনআরডব্লিউএ (UNRWA)—১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তাকারী সংস্থা। বাইডেন ইসরাঈলের ইচ্ছায় এর তহবিল কমিয়ে দিয়েছিলেন, যা সংস্থাটিকে দুর্বল করে দেয়। অন্যদিকে, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর এর তহবিল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।

আমেরিকা তার USAID-এর মাধ্যমে সরাসরি এনজিওগুলোর একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে।

গ্রাম পর্যায়ের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের প্রধান মিডিয়া ও সংসদ সদস্যদের ওপরও তারা প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে দেশে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।

গাজা যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকার বিশ্বে কতটা প্রভাব, তা স্পষ্ট হয়েছে। গাজায় ভয়াবহ মানবতা বিরোধী অপরাধ ক্যামেরার সামনেই চলেছে, কিন্তু জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এমন কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি যা গাজাবাসীর কোনো উপকারে এসেছে। কতবার জাতিসংঘকে আমেরিকা সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দিয়েছে, আবার কখনো সিদ্ধান্ত নিতে দিলেও তা বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। এই যুদ্ধে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবাধিকার ও নারী অধিকারের মতো সুন্দর স্লোগান, যা জাতিসংঘ ও আমেরিকা সমর্থিত এনজিওগুলোর মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তা আসলে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের অস্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।

এটাই হলো আমেরিকার বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যা ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধের কারণে উম্মাহর যে করুণ অবস্থা, তাতে উম্মাহর শাসক ও সেনাবাহিনীর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে ইসরাঈলের সাথে এসব দেশের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা উপকারী হবে। পাশাপাশি এটাও দেখা জরুরি যে, এই দেশগুলো নিজেরাই কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা আল-আকসা মসজিদে ইহুদী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কী ভূমিকা রেখেছে এবং আমেরিকান উপনিবেশবাদ রক্ষা ও শক্তিশালীকরণে তাদের অবদান কী?

উম্মাহর শাসক ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, উপনিবেশবাদের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তা বিলুপ্ত হয়নি। ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে মুসলিম বিশ্বে সরাসরি দখল বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাই

আমাদের এই ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রগুলির জন্ম দেওয়া হয়েছিল। এই দেশগুলো নিজেদের স্বাধীনতা শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেয়নি, বরং তা তাদেরকে শর্তসাপেক্ষে প্রদান করা হয়েছিল— আজ্ঞাবহতা ও আনুগত্যের শর্তে। এ বিষয়ে কিছু পশ্চিমা লেখকও লিখেছেন। যেমন, আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক ডেভিড ফ্রমকিন তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত আরব সরকারগুলো জানত যে, তাদের প্রতিষ্ঠার শর্ত ছিল ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করা।[16]

এই রাজ্যগুলো গঠনের মাত্র ১৩ থেকে ২৬ বছর পর ব্রিটেন ফিলিস্তিনে ইহুদীদেকে নিজেদের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইসরাঈলের জন্ম ঘোষণা করে। ফিলিস্তিনে এই ইহুদী দখল মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ ঘটনা ছিল, যা ইসলামের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত— এটা এই শাসক ও সেনাবাহিনীরাও জানত। তাই তারা এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনী ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল। কিন্তু আসলে তারা সেই যুদ্ধে কী ভূমিকা পালন করেছিল? এটি বুঝতে শায়খ মুস্তাফা আস-সিবাঈ-এর একটি বই থেকে এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও স্মৃতিচারণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

“ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ (১৯১৫–১৯৬৪) সিরিয়ার ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড)-এর আমীর ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে একজন কমান্ডার ও মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধ শেষে তাঁর স্মৃতিকথা ‘জিহাদুনা ফি ফিলিস্তিন’ (ফিলিস্তিনে আমাদের জিহাদ) লিখেন।

[16] Creating the Middle East, 1914-1922

এতে তিনি উল্লেখ করেছেন, “আমরা কীভাবে উম্মাহ হিসেবে দুই চরম শত্রু ও নিকৃষ্টতম গাদ্দারদের মধ্যে পিষ্ট হয়েছি।”

এই বইটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতীয় উপমহাদেশেও আমরা ঠিক একই ধরনের চরিত্রদের মুখোমুখি হয়েছি। এটি পড়লে সহজেই বুঝা যায় যে, ফিলিস্তিন দখলের এই যুদ্ধ আসলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে চলমান এবং পশ্চিমা শক্তিগুলো সর্বত্র একই ধরনের দালাল শাসকদের আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধ

ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার (১৯৪৮) সঙ্গে সঙ্গেই ইখওয়ানুল মুসলিমিন জিহাদের ডাক দিল। এর জবাবে আরব বিশ্ব থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা ইখওয়ানের দিকে ঝুঁকল। এই দৃশ্য দেখে আরব দেশগুলির সংগঠন আরব লীগও (আল-জামাআতুদ দাওয়াহ লিল আরাবিয়াহ, যা ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) ময়দানে নেমে এল। তারা ঘোষণা করল যে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য তারা ‘জায়শুল ইনকাজ’ নামে নিজেদের একটি বাহিনী কুদসে পাঠাবে। সঙ্গে এও ঘোষণা করল যে, যারা জিহাদ করতে চায়, তারা যেন বেসরকারি লোকদের সঙ্গে না গিয়ে জায়শুল ইনকাজেই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেয়। ইখওয়ান এই ঘোষণাকে সন্দেহের চোখে দেখল, তবে তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের সংগঠন থেকে সরাসরি ভর্তি না করে সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সহযোগীদের জড়ো করা শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যেই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ, আদর্শ ও নৈতিক চরিত্র দেখে তারা গভীরভাবে বিচলিত হলো। একবার জায়শুল ইনকাজের একজন কেন্দ্রীয় অফিসার ডক্টর মুস্তাফা আস-

সিবাঈকে ডেকে বললেন: "তোমরা শিক্ষিত ও দক্ষ লোকদের সঙ্গে নেওয়া বন্ধ করো। ফুলের মতো এমন তরুণদের আমরা সেখানে মরতে পাঠাব না। বরং অপরাধী ও সাজাপ্রাপ্ত লোকদের ভর্তি করো, তারা যুদ্ধের জন্য বেশি উপযুক্ত।"

এটি শুনে শায়খ মুস্তাফা আস-সিবাঈ-কে জবাব দিয়ে বলতে হয়েছিল যে, এই যুদ্ধ শারীরিক শক্তি ও পেশীর দৃঢ়তার চেয়ে বেশি চেতনা, ত্যাগ ও ঈমানের দৃঢ়তার। আর ইহুদীরা এই বিবেচনা থেকেই তাদের সেরা লোকদের যুদ্ধে পাঠিয়েছে।

ইখওয়ানি নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থা থেকে আলাদা সংগঠন চালানোর অনুমতি চাইল। অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু সঙ্গে এও জানিয়ে দেওয়া হলো যে, এখন থেকে তোমাদের নিজেদের অস্ত্রের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে! ডক্টর মুস্তাফা আস-সিবাঈর মতে, আরব লীগ এই কাজের জন্য বিপুল তহবিল বরাদ্দ করেছিল। আমাদের অস্ত্র সরবরাহ করা তাদের জন্য কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল আমাদের পথ রোধ করা। তাই আমাদের অস্ত্র থেকে শুরু করে খাদ্য ও বস্ত্র— প্রয়োজনীয় সব জিনিসের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়েছিল, আর তা করা ছিল প্রায় অসম্ভব রকমের কঠিন। অন্যদিকে, যেসব স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনীর কাছে গিয়েছিল, তাদের সবকিছুই উচ্চমানের দেওয়া শুরু করা হয়েছিল।

ফিলিস্তিনে মুজাহিদরা যুদ্ধের পর যুদ্ধ করতে থাকল, অথচ আরব লীগের জায়শুল ইনকাজ ও তাদের অধীনস্থ স্বেচ্ছাসেবকরা খুব কমই কোনো অভিযান পেত। তাদের প্রতিটি ছোট-বড় কাজের জন্য বাইরের নেতৃত্ব থেকে অনুমতি নিতে হতো। অন্যদিকে, মুজাহিদদের অভিযানের সময় যেখানেই ইহুদীরা

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো, তারা মুজাহিদদের বদলে জায়শুল ইনকাজের হাতে আত্মসমর্পণের শর্ত রাখত, কারণ এতে তাদের সুবিধা দেখা যেত।

একবার শহরে (বায়তুল মুকাদ্দাস) গোলাবারুদের মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিল। ডক্টর মুস্তাফাকে গুলি সংগ্রহ করতে সেনা ক্যাম্পে যেতে হলো। সেখানে সংশ্লিষ্ট সেনা জেনারেলের সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসের সংকটাপন্ন অবস্থা বর্ণনা করে আসন্ন ঝুঁকির কথা জানালেন। জেনারেল তাদের গুলি দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন এই বলে যে, "আপনাদের অস্ত্র জার্মানিতে তৈরি, আর আমাদের গুলি ব্রিটিশ।"

শায়খ মুস্তাফা সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে গেলেন। প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট অফিসারকে গুলি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অফিসার মাত্র পাঁচ হাজার গুলি শেখের হাতে দিয়ে বললেন, "আমাদের কাছে গুলি কম, তবে প্রেসিডেন্টের সুপারিশ থাকায় বাধ্য হয়ে দিলাম!"

শায়খ মুস্তাফা অফিসারকে জবাব দিলেন, "এই গুলি যদি আমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করি, তাহলে প্রতি মুজাহিদের ভাগে মাত্র দশটি করে পড়বে। এই কঠিন যুদ্ধে একজন মুজাহিদ এই দশটি গুলি দিয়ে কী করবে?"

বায়তুল মুকাদ্দাসের পতনের আশঙ্কা একবার তীব্র হয়ে উঠল এবং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি এমন হয় তবে সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটবে। তাই শায়খ মুস্তাফা জায়শুল ইনকাজের স্থানীয় দায়িত্বশীলের মাধ্যমে একটি আরব রাজধানীতে ফোন করালেন, তাদের সামনে পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরলেন, তাৎক্ষণিক সামরিক সহায়তা পাঠানোর দাবি জানালেন এবং সতর্ক করলেন যে যদি সাহায্য না আসে, তাহলে নারী ও শিশুদের নির্মম হত্যার শিকার হতে হবে।

নেতৃত্ব ভুল বুঝে বসে ধারণা করল যে বায়তুল মুকাদ্দাসে যুদ্ধরতরা তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী। ফলে তিনি সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সাথে সাথে নির্দেশ দিলেন:

أنا أمرك بالإنسحاب وأنتم عندنا أغلى

("আমি তোমাকে অবিলম্বে সেখান থেকে সৈন্যদের নিয়ে সরে আসার আদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান।")

অর্থাৎ, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের রেখে যাও, তাদের হত্যা হতে দাও, শুধু তোমরা নিরাপদে ফিরে আসো!

অল্প সম্পদ ও সৈন্য সংখ্যা সত্ত্বেও মুজাহিদরা অবিচল থাকলেন। এমনকি যখন আরব লীগ ১৯৪৯ সালের চুক্তি স্বাক্ষর করল— যার মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাস জায়শুল ইনকাজের হাতে ছেড়ে দিতে এবং মুজাহিদদের দামাস্কাসে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো— তবুও তারা সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন।

ডক্টর মুস্তাফা আল-সিবাঈ তাঁর বইয়ের শেষে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো লিখে আরব বাহিনীর ভূমিকার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেছেন:

"প্রথমত: আরব লীগের ফিলিস্তিনে সেনা প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের ক্রুদ্ধ জনগণকে শান্ত করা। তাদের লক্ষ্য কখনোই যুদ্ধ করা বা ফিলিস্তিনি জনগণ ও ভূমির প্রতিরক্ষা ছিল না।

দ্বিতীয়ত: জায়শুল ইনকাজের যে সামরিক নেতৃত্ব যুদ্ধে বাহিনীকে পরিচালনা করেছিল, তারা ফিলিস্তিনের ভেতরে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, বরং ফিলিস্তিনে প্রবেশই করেনি। তাদের ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোর কোনো

ধারণাই ছিল না। তারা পুরো সময়টা আরব ভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে বসে থাকত এবং দামেস্ক ও কায়রোর মধ্যে ঘুরে বেড়াত।

তৃতীয়ত: জাইশুল ইনকাজের মূল কাজ ছিল মুজাহিদদের ব্যর্থ করা। ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের আমীর শহীদ আব্দুল কাদির হুসাইনি একদম শেষ মুহূর্তে জাইশুল ইনকাজের কাছে গিয়ে অস্ত্র চেয়েছিলেন, কিন্তু সেনাবাহিনী তাকে তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শহীদ আব্দুল কাদির এ ঘটনায় আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: 'আমি তাদের কাছে মাত্র একটি কামান চেয়েছিলাম, তারা তা দিতে অস্বীকার করল এবং এমন সব অকেজো রাইফেল আমার হাতে তুলে দিল যা শুধু পুড়িয়ে ফেলাই যায়।'"

ড. মুস্তাফার মতে, এগুলো ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেল যা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাইফেলগুলো দেখানোর পর আব্দুল কাদির বলেছিলেন, "আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত ফিলিস্তিনে লড়াই করব এবং শত্রুর জন্যে এটাকে কখনোই সহজ শিকার হতে দেব না।"

আব্দুল কাদির কায়রোতে অবস্থিত আরব লিগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নামে আবারও চিঠি লিখেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন: "আপনারা বেঞ্চ যুদ্ধে আমার মুজাহিদদেরকে কোনো সাহায্য ও অস্ত্র ছাড়াই ফেলে রেখেছিলেন, আমি এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তাই।" এই চিঠির দুই দিন পর তিনি শহীদ হন, এরপর দির ইয়াসিন পতন হয় এবং ইসরাঈল সেখানে ভয়াবহ গণহত্যা চালায়।

তোমাদের সেনাবাহিনীই তোমাদের হত্যাকারী!

১৯৫২ সালে বাইতুল মুকাদ্দাসে অনুষ্ঠিত আল-কুদস কনফারেন্সে শহীদ সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি এই সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেন: "তোমরা কি মনে করো যে এই আরব সেনাবাহিনী ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য লড়াই করবে? কখনোই না! এগুলো তোমাদেরই হত্যার জন্য গঠন করা হয়েছে। মনে রেখো! এরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি গুলিও চালাবে না।"[17]

সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর এই বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাদের পুরো ইতিহাসই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। আর এখন গাজা যুদ্ধে আবারও তা স্পষ্ট হয়েছে যে, এই বাহিনীগুলো ইসরাঈলের বিরুদ্ধে শুধু বাচালতা, সম্মেলন ও প্রস্তাবের নাটকই ভালোভাবে করে, কিন্তু বাস্তবে তারা ইসরাঈল ও পশ্চিমেরই স্বার্থ রক্ষা করে যায়। তাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের জনগণকে দমন করা এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রকে মুসলিম জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা।

এই যুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও জর্ডানের পক্ষ থেকে যুদ্ধ চলাকালীন ইসরাঈলকে সরঞ্জাম ও তেল সরবরাহ অব্যাহত ছিল। ইসরাঈলি মিডিয়া[18] খবর দিয়েছে যে, আরব সরকারগুলো হামাসকে নির্মূল করার পূর্ণ সমর্থন দেয়। [19] পুরো যুদ্ধের সময় মিশরীয় সেনা গাজার অবরোধ বজায়

---

17 আনসারুন নাবী ম্যাগাজিন, ইবরাহীম গৌশা রহিমাহুল্লাহ'র প্রবন্ধ

18 উদাহরণস্বরূপ, ইসরাঈলি সংবাদপত্র 'Globes' ও 'euro news'

19 ট্রাম্পের পূর্ববর্তী শাসনামল থেকে এখন পর্যন্ত সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্র গাজার মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ২০১৮ সালে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিটিকে সম্বোধন

রেখেছে। মিশরীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কথা বলতে লজ্জা বোধ করেননি যে, “সীমান্ত খোলা বা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত আমরা নিই না, ইসরাঈল নেয় এবং তারা আমাদেরকে জানিয়ে দেয়।”

ক্যামেরায় ধরা পড়েছে আরও মর্মান্তিক একটি দৃশ্য—গাজার এক যুবক যখন ক্ষুধা ও বোমাবর্ষণ থেকে বাঁচতে মিশরের দিকে দেয়াল টপকাতে যায়, মিশরীয় সেনারা তাকে গালিগালাজ করে এবং মারধর করে অচেতন করে ফেলে।[20]

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তার প্রকাশিত ডায়েরিতে (প্রকাশিত গ্রন্থ) [21] লিখেছেন, ১৯৯৬ সালে তিনি জর্ডানের রাজা হুসেইনের সাথে সাক্ষাৎ

করে এই কথা বলেছিলেন। এছাড়া সম্প্রতি সৌদি রাজপুত্র ওয়ালিদ বিন তালাল সাংবাদিক টাকার কার্লসনের সাথে সাক্ষাৎকারে গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান পদক্ষেপের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আশা করি আমেরিকা হামাসকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে।

—১৯৪৮ সালের যুদ্ধে মুসলিম শাসকদের ভূমিকা ছিল বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ।

- ফিলিস্তিন ইস্যু শুধু একটি ভূখণ্ডের লড়াই নয়, বরং সমগ্র উম্মাহর বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের অংশ।

- ভারতে যেমন ব্রিটিশ ও তাদের দোসররা বিভাজন ও দখল নীতি চালিয়েছে, ফিলিস্তিনেও একই কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

ড. সিবাঈ-এর লেখনী থেকে স্পষ্ট—আমাদের সংগ্রাম শুধু ইসরাঈল নয়, বরং সেই সকল শাসক ও শক্তির বিরুদ্ধে, যারা পশ্চিমের স্বার্থে উম্মাহর ঐক্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে।

[20] ২০১৫ সালের একটি ঘটনার ভিডিও-ও পাওয়া যায়, যখন একজন মানসিকভাবে অক্ষম যুবক গাজার সমুদ্রসৈকতে স্নান করার সময় মিসরের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করে। মিসরীয় সেনা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

[21] A Place Under the Sun: A Memoir (সূর্যের নিচে একটি স্থান: একটি স্মৃতিকথা)

করেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, “আপনার সরকারের সুরক্ষা আমাদের দায়িত্ব। যদি আপনি কোনো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক হুমকির সম্মুখীন হন, ইসরাঈলি সেনা জর্ডানে প্রবেশ করে আপনার সরকারকে রক্ষা করবে।”

ইসরাঈলের সামনে এই সরকারগুলো নতজানু হওয়ার রহস্য কী? ২০১৭ সালে কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হামাদ বিন জাসিম একটি সাক্ষাৎকারে এর উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “স্পষ্ট করে বলবো? আমেরিকার সাথে সম্পর্ক রাখা সবারই আকাঙ্ক্ষা। সবাই এজন্য চেষ্টা করে, আর আমেরিকা হোয়াইট হাউসের দরজা ইসরাঈলের হাতে রেখেছে।”[22]

অর্থাৎ, আমেরিকা কেবল তখনই কাউকে কাছে টানে এবং তার জন্য নিজের দরজা খোলে, যখন সে ইসরাঈলের সামনে মাথা নত করে।

উল্লেখ্য, ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার আগেই আমেরিকা আরব বিশ্বে সামরিকভাবে পা রাখার জায়গা করে নিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে সৌদি আরবের ধাহরান এলাকায় ‘ধাহরান এয়ার বেস’ নামে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। [23] অর্থাৎ, ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই আমেরিকা এখানে কার্যত উপস্থিত ছিল। আর আজ তার এই পরিশ্রমের ফল হলো—সমস্ত আরব দেশ ইসরাঈলকে অঞ্চলের শাসক হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং নিজ নিজ দেশে ইসরাঈল প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

“বোঝা যাচ্ছে, এই শাসকদের ইসরাঈলের সামনে আমেরিকা নত করেছে, কিন্তু কোনো জিনিস তাদের নিজেদের আমেরিকার দাস বানিয়েছে? তাদের

---

[22] ২৫শে অক্টোবর ২০১৭, আল-জাজিরা টিভি চ্যানেল

[23] Toby Craig Jones লিখিত Desert Kingdom (টোবি ক্রেইগ জোনসের ‘ডেজার্ট কিংডম’ বই থেকে)

নিজের স্বার্থপরতা ও বিলাসিতাই তাদেরকে আমেরিকার দাস বানিয়েছে। এর জন্যই তারা পবিত্র স্থানগুলোর বাণিজ্য করেছে এবং এর কারণেই এই উম্মাহর সম্পদ লুট করতে তারা সেই ডাকু ও চোরদের সহায়ক হয়ে উঠেছে। ট্রাম্প আজ প্রকাশ্যে বলে...

সৌদি বাদশাহকে বলা হয়েছিল: “মহারাজ! আপনার কাছে ট্রিলিয়ন ডলার আছে, কিন্তু আমরা না থাকলে এগুলো আপনার কোনো কাজে আসবে না। আমাদের সুরক্ষা ছাড়া আপনার সরকার দুই সপ্তাহও টিকতে পারবে না। আপনাকে আমাদের অংশ দিতেই হবে।”[24]

ফিলিস্তিনের বাইরে ফিলিস্তিনের যুদ্ধ

এমন পরিস্থিতিতে গাজাবাসীদের কেন সাহায্য করা যায়নি—এই প্রশ্নের সবচেয়ে সরল উত্তর হলো: আমাদের দেশগুলোর সেই যুদ্ধ, যা আমেরিকার সমর্থনে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। বিষয়টি সহজভাবে বোঝার নিয়ম হলো: যে সেনাবাহিনী বা সরকার ইতিহাসে যত বেশি আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল, গাজাবাসীদের অবরুদ্ধ করার পেছনে তাদের ভূমিকা তত বেশি। গাজার যুদ্ধ শুরু হয়েছে সাত অক্টোবর, অথচ এই বাহিনীগুলো দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এমনই নির্লজ্জ যে, তারা একদিকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার মিত্র, তারা নিজেদের ভূমি আমেরিকার সামরিক ঘাঁটির জন্য উৎসর্গ করে, তারা ভাড়াটে খুনি হয়ে আমেরিকার থেকে

[24] ভিডিও ক্লিপ যেখানে ট্রাম্প একটি সমাবেশে বক্তৃতা করছেন

বিলিয়ন ডলার শুষে নেয় [25], নিজেদের নির্যাতন-কক্ষগুলোকে ‘উম্মাহর প্রতিরক্ষার’ জন্য যুদ্ধরত মুজাহিদীন দিয়ে পূর্ণ করে এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ে আমেরিকার দাসত্ব করে অপরদিকে যখন গাজাবাসীদের গণহত্যা চলে, তখন কুমিরের চোখে অশ্রু ফেলে, সম্মেলনের আয়োজন করে এবং গাজার পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে প্রশংসা কুড়ায়।

তুরস্ক, পাকিস্তান ও আরব উপসাগরীয় দেশগুলোতে এই একই দ্বিচারিতা ও কপটতা বিদ্যমান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আমেরিকাকে প্রদত্ত সেবাগুলো কি কোনো গোপন বিষয়? দুঃখের বিষয়, আমাদের কিছু ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতা গাজার ধ্বংসযজ্ঞে নীরব রয়েছেন।

আমি শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ, কিন্তু একই সাথে যেসব সেনাবাহিনী আমেরিকাকে রক্ষা করে, তাদেরকে নিজেদের সেনাবাহিনী বলে দাবি করি; আমেরিকাকে উম্মাহর শত্রু ঘোষণা করি, অন্যদিকে যেসব মুজাহিদ আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়েছিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আমেরিকান যুদ্ধকে তাদের বিরুদ্ধে ‘জিহাদ’-ও বলি।

গাজাকে কি এভাবে সাহায্য করা সম্ভব? আমেরিকার দাসত্ব কবুল করা মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনীগুলোর পক্ষ নিয়ে যদি আমরা এভাবে অজুহাত দাঁড় করাই, তাহলে কি কখনও ইসরাঈলকে দুর্বল করতে পারব? গাজার মানুষের ত্যাগ, ধৈর্য ও অটলতা দেখে যখন তারা বিজয় অর্জন করে, তখন তাদের জন্য উল্লাস করা এবং প্রশংসার স্তুতি গাওয়া, অথচ নিজেদের দেশে যারা গাজার বিপক্ষে অপরাধে জড়িত সেই অপরাধী

---

[25] ২০০২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকা পাকিস্তানকে ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতার’ নামে ১৩৩ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে—এটি শুধু প্রকাশ্য সহায়তা, অপ্রকাশ্য সহায়তা এর চেয়ে অনেক বেশি।

বাহিনীকে সম্মান ও নিরাপত্তা দেওয়া এবং আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সেই যুদ্ধকে দ্বীন ও মিল্লাতের স্বার্থে উপস্থাপন করা—এটা তো কেমন যেন এখানে-সেখানে থেকে টুকরো এনে জোড়া লাগানো একটা জোড়াতালির মতো আচরণ। এখন সময় এসেছে এই সব দ্বিচারিতা থেকে বের হয়ে আসার। আমাদের সমর্থন বা বিরোধিতা এবং ভালবাসা বা শত্রুতা—সবকিছুর ভিত্তি জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের সেক্যুলার নীতির ওপর নয়, বরং ইসলামের নীতির ওপর স্থাপন করা এবং তা শরিয়তের আলোকে গঠন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

গাজা যুদ্ধ ও মসজিদুল আকসার মুক্তির সংগ্রাম শুধু ফিলিস্তিনেই সংঘটিত হতে পারে— এমন ধারণা করা কেবল সরলতা নয়, বরং এটি উম্মাহর বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। এটি সূর্যের আলোর চেয়েও স্পষ্ট যে, ফিলিস্তিনে গাজাবাসীর এই সংগ্রাম তখনই সফল হবে, যখন আমরা এর বাইরে নিজেদের ভূমিতে—যেখানে আমরা প্রকৃতপক্ষে কিছু করতে সক্ষম— এটিকে নিজেদের সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করব এবং ইসরাঈলের প্রাণস্বরূপ শক্তিগুলোকে দুর্বল করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হব। ব্রিটিশ-গঠিত এই জায়নিস্ট দাসসেনাকে নিজেদের বাহিনী বলে দাবি করার পরিবর্তে আমাদের নিজেদের ইসলামী বাহিনী গঠন করতে হবে, মসজিদ-মাদরাসা ও মিম্বর-মিহরাবকে আমাদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে এবং নিজেদের ভূমিতে হিজবুল্লাহর মতো হয়ে হিজবুশ শয়তান— এই জায়নিস্ট জোটের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে।

এখন সময় এসেছে যে, আমরা খোলা চোখে হিমালয়ের মতো উচ্চ ও স্পষ্ট সত্যের দিকে তাকাবো এবং এর অস্তিত্ব স্বীকার করব। গাজার ধ্বংস ও পবিত্র স্থানগুলির উপর আধিপত্যের দায় শুধু ইসরাঈলের নয়, বরং এর মূল ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল আমেরিকান জোটের। এখন আমাদের এই সত্য মেনে

নেওয়া জরুরি এবং তারপর এই বিষয়ে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে যে, আমেরিকা হলো উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেওয়া সেই বৈশ্বিক ঔপনিবেশিক শক্তি, যা উপেক্ষা করা স্ববিরোধিতা, গাজাবাসীর প্রতি অবিচার এবং এই নির্যাতিত মানুষদের এই জায়নিস্ট শক্তির মুখে একা ছেড়ে দেওয়া হলো মুসলিম উম্মাহর দুর্দশা ও দাসত্বের রাতকে দীর্ঘায়িত করা।

এই সত্যটিও স্বীকার করা উচিত যে, এই বাহিনীগুলো হলো জায়নবাদী উপনিবেশের সৈনিক। এগুলোকে নিজেদের ভেবে আমরা না ইসরাঈল ও আমেরিকার কবল থেকে উম্মাহ ও তার পবিত্র স্থানগুলো মুক্ত করতে পারব, আর না শরীয়ত বাস্তবায়নের দিকে এক কদমও এগোতে পারব। যখন এটাই সত্য, তখন আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত— যে সংগ্রামে এই বাহিনীগুলোকে নিজেদের ভাবা হয়, সেখানে তাদের অপসারণ ও তাদের স্থানে আল্লাহভীরু মুজাহিদ শক্তি আনার কোনো গভীর প্রচেষ্টা না থাকলে, এমন প্রচেষ্টা কি নির্যাতিত উম্মাহর কোনো উপকারে আসতে পারে? পৃথিবীতে কি এমন শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কখনো সফল হয়েছে? আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, আমেরিকান দ্যা র‍্যান্ড কর্পোরেশন প্রণীত ও সমর্থিত পথগুলোকে সঠিক ভেবে সেগুলোতে চললে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা জায়নবাদী উপনিবেশকেই সাহায্য করব। আর এটা হলো চোখ বুজে এমন পথে চলা, যার ভোগান্তি গোটা উম্মাহ আজ ভুগছে।

জেরুজালেমের মুক্তি একটি অধিকার

আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে রুখে দাঁড়ানো উম্মাহর ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, বরং বাধ্যবাধকতা (এই উম্মাহ স্বেচ্ছায় কোনো অপশন হিসেবে এই পথ গ্রহণ

করবে— বিষয়টা এমন নয়; বরং উম্মাহ এই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য)। এখন প্রশ্ন হলো— এই জিহাদ কি আদৌ সম্ভব? বাস্তবতা হলো, এই জিহাদ নিঃসন্দেহে কঠিন, কিন্তু একেবারেই অসম্ভব নয়। তিন দশক আগে উম্মাহ-দরদী শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ তাঁর ঘর-বাড়ি, জন্মভূমি, সম্পদ, সন্তান ও সহচরদের কুরবানি দিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর সহচররা—বিশেষত শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী যুক্তি-প্রমাণসহ আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের অপরিহার্যতা এবং তার পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এই পুরো সময়ে কোনো একটি ঘটনাও তাদের এই দাওয়াত ও আহ্বানকে ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকি গাজার বর্তমান যুদ্ধ এই বিশ্বব্যাপী ক্যান্সারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং উম্মাহকে জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তার উপর নতুন করে সত্যতার সিলমোহর এঁটেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে যে, বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে এই অপমান থেকে উদ্ধার করতে চাইলে, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই।”

এমন অবস্থায় যদি আমরা এই আহ্বানকে শুধু এই কারণে উপেক্ষা করে এর বিরোধিতা শুরু করি যে এটি কঠিন, তাহলে কি আমরা বাস্তবতা পরিবর্তন করতে পারব? তাহলে কি মুসলিম উম্মাহর কষ্ট লাঘব হবে? নাকি কঠোর ভাষায় বলতে গেলে, আল্লাহ না করুন, আমাদের ও উম্মাহর গন্তব্য কি ভিন্ন? তাহলে যদি কঠিন ও সহজই মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে গাজাবাসীর প্রশংসা আমরা আবার কেন করব? তারা কি কঠিন ও সহজ দেখে ‘তুফানুল আকসা’-এর পথ বেছে নিয়েছিল? যদি আমরা বলি যে তাদের কোনো বিকল্প পথ ছিল না এবং তারা এই যুদ্ধে ন্যায়সংগত ছিলেন, তাহলে কি আজ আমাদের কাছে এমন কোনো পথ অবশিষ্ট আছে যার মাধ্যমে আমরা

ফিলিস্তিনের কোনো সাহায্য করতে পারি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরাগভাজন না হয়ে, কোনো ব্যক্তি কি এটা প্রমাণ করতে পারে যে আজ না হোক কাল ইসরাঈলের অস্তিত্ব আমরা ধ্বংস করে দেব?

আমেরিকা অপরাজেয় নয়!

আমরা এও জানিয়ে দিতে চাই যে, আমেরিকার দাসত্বকারী বাহিনী ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ এবং স্বয়ং আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ— এ দুটি পরস্পর বিপরীত বা বিরোধী নয়; বরং এ দুটি সমান্তরাল এবং একে অপরকে সুযোগ ও শক্তি প্রদানকারী। তাই যেখানেই জিহাদের সুযোগ দেখা যাবে, এসব দাসত্বকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করা অপরিহার্য। এর ফলাফল ইনশাআল্লাহ্ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের উপর সামরিক আঘাত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হিসেবে প্রকাশ পাবে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়ায় আমেরিকার গুরুত্ব এবং তাকে ক্ষতি পৌঁছানোর অপরিহার্যতা সর্বদা সামনে রাখতে হবে। কারণ, এই শাসক ও বাহিনীগুলো দাস ও হাতিয়ার মাত্র, অন্যদিকে আমেরিকা ইসরাঈলসহ সকলকে সুরক্ষা ও সমর্থন দিয়ে থাকে। এসব ব্যবস্থার কোনো একটি পতনও নির্ভর করে আমেরিকার পিছু হটার উপর— যার নমুনা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে বিশ্ববাসী দেখেছে।

আমেরিকার সামরিক শক্তি ও এর ব্যাপ্তি নিঃসন্দেহে বিশাল, তবে এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে— আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকা কোনোভাবেই অপরাজেয় নয়! এর বার্ষিক সামরিক ব্যয় আটশো বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মোট সামরিক খরচের ৪১%। কিন্তু এই শক্তিই আমেরিকার দুর্বলতাও হয়ে উঠতে পারে— বিশেষত এই কারণে যে, এটি প্রচলিত যুদ্ধে কার্যকর হলেও

অপ্রচলিত যুদ্ধে সম্পূর্ণ অকার্যকর। আর মুজাহিদদের রণক্ষেত্র হলো এই অপ্রচলিত যুদ্ধ। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমেরিকার ঔদ্ধত্য ভেঙে দিয়েছেন। তাই এই জিহাদের পথে যখন এর নিরাপত্তা ব্যয় বাড়ানো হবে, তখন মার্কিন অর্থনীতি উম্মতের জাগরণ ও এই জিহাদের কারণে দুর্বল হয়ে পড়বে। আর এমন হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়; বরং আল্লাহর সাহায্য ও মুসলিম উম্মাহর জিহাদ ও দৃঢ়তার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ এটিই সংঘটিত হবে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকার এই বিশাল সামরিক পরিকাঠামোই তার উপর বিপর্যয়কর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। ইনশাআল্লাহ, এটিই তার পতনের কারণ হবে এবং তখনই সেই সময় আসবে যখন ইসলামী বাহিনীর অগ্রগতিকে পৃথিবীর কোনো শক্তি আর ঠেকাতে পারবে না।

অতএব, আমাদের অবশ্যই এই সচেতনতা ও বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে যে:

- মসজিদে আকসাকে মুক্ত করা এবং নিজের ভূখণ্ডে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ফরযে আইন (ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক) চেষ্টা। আর এই চেষ্টা তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদকে নিজের উপর ফরয হিসেবে মনে করব এবং আমাদের আন্দোলন ও সংগ্রামে একে মুখ্য ভূমিকা দেব। যদি আমাদের এই সংগ্রামে আল্লাহর পথে লড়াই তথা কিতালের অর্থে জিহাদ না থাকে, তাহলে তা উম্মাহর সমস্যার সমাধান তো করবেই না, বরং সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেবে। আর আল্লাহর কিতাবে ফরযে আইন জিহাদ ত্যাগ করার ব্যাপারে যে কঠোর সতর্কবার্তাগুলো রয়েছে– (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন) তা আমাদের ওপর সত্য প্রমাণিত হতে পারে।

- আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, বৈশ্বিক ব্যবস্থায় আমেরিকার হাতের অস্ত্র, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা, ইসরাঈলের রক্ষায় তার মূল ভূমিকা এবং ইসলামী শাসন কায়েমে যে বাধাসমূহ তৈরি হয়, সেই সমস্ত বাহিনী ও ব্যবস্থার ওপর আমেরিকার প্রভাব– এসব বোঝা এবং অন্যদের বোঝানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা আমাদের শত্রুকে সঠিকভাবে বুঝতে পারি এবং সত্য ও মিথ্যার এই লড়াইয়ে চিন্তাগত ও সামরিকভাবে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারি।
- আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব আমরা যেন নিজেরাও বুঝি এবং অন্যদেরও বুঝাতে পারি। আর যতটা সম্ভব এই জিহাদে আমরা যেন নিজেরা অংশগ্রহণ করি। সেই সাথে এই জিহাদে উম্মাহর যত বেশি স্তরের মানুষকে সম্ভব, সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করি। আমেরিকা এই যুদ্ধকে সংকুচিত ও সমাপ্ত করতে চায়, আর আমরা যেন এটিকে তার চেয়েও বেশি বিস্তৃত করার কাজ করি।
- নিজেদের দেশের সেনাবাহিনী, শাসকগোষ্ঠী ও শাসন ব্যবস্থা যে মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কিভাবে উম্মতকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে– এই ভয়ংকর বাস্তবতা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। এরপর শরঈ ও বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতাল (সশস্ত্র প্রতিরোধ)-এর ফরয হওয়াকে প্রমাণ করতে হবে। তবে এই লড়াইয়ে অবশ্যই এমন সব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ভুল থেকে বিরত থাকতে হবে, যেগুলোর ফলে শয়তানে আকবর তথা বড় শয়তান বা উপনিবেশবাদী শক্তির স্বার্থ রক্ষা পায়। মনে রাখতে হবে, এই শয়তানকে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এই শাসন ব্যবস্থাগুলোর পতন কঠিন।

- মসজিদে আকসা ও গাজাবাসীদের সাহায্য ও সমর্থনের যে যুদ্ধ, সেটি কেমন হওয়া উচিত— এই বিষয়ে সচেতনতা বিস্তার অত্যন্ত জরুরি। বোঝাতে হবে, এই যুদ্ধ যেমন গাজা ও ফিলিস্তিনের ভেতরে চলছে, তেমনি ফিলিস্তিনের বাইরে থেকেও সমানভাবে এটি চালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। ফিলিস্তিনি মুজাহিদগণ কেবল তখনই বিজয়ী হতে পারবেন, যখন ফিলিস্তিনের বাইরে থেকে উম্মতের পক্ষ থেকে সেই ইহুদীবাদী শয়তানের বিরুদ্ধে সফল জিহাদ পরিচালিত হবে, যে বড় শয়তান ইসরাঈলকে গাজাবাসীদের বিরুদ্ধে টিকিয়ে রেখেছে।
- এই যুদ্ধ সামরিক ময়দানে অবশ্যই জরুরি এবং সামরিক যুদ্ধ থেকেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল আসবে। কিন্তু সামরিক যুদ্ধ তখনই কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে, যখন চিন্তা ও দাওয়াহর (চেতনা ও আহ্বানের) ময়দানে এটিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা হবে। শত্রুর সঠিক পরিচয়, তার ধোঁকা ও প্রতারণা, বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা ও তার দাজ্জালী পরিভাষা, স্লোগান ও ষড়যন্ত্রের প্রকৃত চিত্র, এরপর বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক, এই ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কৌশল— এই সবকিছু আমরা যত স্পষ্টভাবে উম্মতের সামনে তুলে ধরতে পারব, ততই সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার হবে এবং একই সাথে উম্মতের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পুনর্গঠনেও অগ্রগতি হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা ও পয়েন্টগুলোর মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ অথবা আরো বেশি তাৎপর্যবহ পয়েন্ট হচ্ছে:

আমরা যেন শক্তি-দুর্বলতা ও বিজয়-পরাজয়ের সকল বিষয়ে এমন ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস, তাওয়াক্কুল ও ভরসা অর্জন করি যা আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে চান।

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ: বিজয় তো কেবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।[সূরা আলে-ইমরান ০৩:১২৬]

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

অর্থ: আল্লাহ যদি আপনাদের সাহায্য করেন, তবে কেউই আপনাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি আপনাদেরকে ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে যে আপনাদের সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।[সূরা আলে ইমরান ০৩:১৬০]

অতএব, শক্তি ও সামর্থ্যের দুনিয়াবি মাপকাঠিকে এক পাশে সরিয়ে রাখতে হবে এবং একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। যদি আমাদের রব আমাদের সাহায্য করেন, তবে দুনিয়ার কোনো শক্তিই আমাদেরকে নত করতে পারবে না। আমরা কারো শক্তির কাছে পরাজিত হবো না। কিন্তু আল্লাহ না করুন, যদি আমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করি, তবে আমাদের কাছে অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও আমরা ব্যর্থতা ও হতাশা থেকে রক্ষা পাবো না।

অতএব, অন্তর ও দেহ নিয়ে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হয়ে যেতে হবে এবং অন্যদেরকে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা যেন আল্লাহর জন্য তাকওয়া অবলম্বন করি এবং সব ধরনের জুলুম থেকে বেঁচে থাকি।

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে পারি এবং এর পরিণাম গোটা সমাজ ও উম্মাহর উপরও পড়তে পারে।

তাই গাজাবাসীদের সাহায্য করার প্রকৃত উপায় হলো— আমরা আল্লাহর অনুগত ও প্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টা করবো, তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী হয়ে উঠবো। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে ভালোবাসা-ঘৃণা ও বন্ধুত্ব-শত্রুতার মানদণ্ড পর্যন্ত— সবকিছুই আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের অনুসারী হোক। এরপর আসে আল্লাহর পথে জিহাদ, আর এর আওতায় আসে মুসলিম উম্মাহর সকল শ্রেণির সাথে আচরণ— যোদ্ধা ও অযোদ্ধা উভয়ের সাথেই। তাই এসব ক্ষেত্রে আমরা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে উঠবো। এমনটি করলে তা থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হবে, অতঃপর তাঁর সাহায্য প্রাপ্তি ঘটবে, আর এর মাধ্যমে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমরা মসজিদে আকসাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবো।

আমাদের শেষ কথা: সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

****